Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IV, Issue-IV, April 2016, Page No. 1-6
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্র ভাবনায় প্রকৃতিসত্তা ও পরমসত্তা

সুজিত কুমার মন্ডল

সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বোলপুর কলেজ, বোলপুর, বীরভূম, কলকাতা, ভারত

Abstract

In Tagore's philosophy, three types of Satta's are mentioned–Prakatisatta, Manabsatta and Paramsatta. From childhood Rabindranath was very much interested with nature. In 'Jeebansmriti', we find that Rabindranath started his life by integrating himself with nature. He was very much influenced by nature. As its evidence, we find plenty of green trees around his house. According to Rabindranath, a separate satta exists in everybody's mind which led him to think of others. He called it as paramsatta. It reveals itself by establishing a relationship of love with others. Based on this relationship Rabindranath established his 'Jeebandevta' Tatta. In this paper an attempt has been made to analyse the Prakitisatta and Paramsatta, as developed by Rabindranath.

বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে পৃথিবীতে আসে জীব-জগত। এই জীব-জগতের কোন এক পর্বে মানুষের আবির্ভাব ঘটে। বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষের পরিচয় অন্যান্য প্রাণীর মত একটি প্রাণীরূপে। মানুষের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, অনন্তকাল ধরে সৃষ্টির বিবর্তন ধারা মানুষের ইতিহাসে এসে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনের প্রতিটি স্তর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষকে গড়ে তোলার জন্য মানুষের পূর্ববর্তী বিবর্তনের সকল চেষ্টা ক্রিয়াশীল ছিল এবং সৃষ্টির পর সেই মানুষকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে তোলা প্রকৃতির লক্ষ্য ছিল। এই ভাবে বিশ্ব প্রবাহের ধারার সঙ্গে মানুষ যুক্ত হয়েছে। বিশ্বপ্রবাহের ইতিহাস থেকে মানুষের ইতিহাস কখনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নি। বিচ্ছিন্ন হয়নি জড় বস্তুর ইতিহাসও। যুগ-যুগান্তর হতে এই সত্য জৈব প্রবাহের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় নীহিত আছে। কখনও তা প্রকাশিত হয়েছে আবার কখনও তা অব্যক্ত থেকে গেছে। এই ইতিহাস মানুষের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে। মানুষের দেহগত অবস্থান জড়াত্মক হলেও তার অতিক্রমণ ঘটে মানুষের মানসিক অবস্থানের মধ্যে দিয়ে। দেহগত বিভিন্ন পারস্পরিক সম্বন্ধ অপেক্ষা অনেক গভীর এক মানসিক অনুভূতির মুখোমুখি হতে পারে একমাত্র মানুষই। মানুষ এক গভীর সত্তার অনুভূতি লাভ করে, যার প্রকাশ ঘটে তখন, যখন সে নিজেকে দেখতে শেখে, জানতে শেখে, প্রেমে-কর্মে-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে শেখে, আর ততই সে তার অন্তর্নিহিত সত্তার কাছাকাছি যায়। এ এক এমন অনুভূতি যা মানুষকে তার সত্তার সঙ্গে বৃহৎকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে একাত্ম করে।

মানুষ স্বরূপত সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের যেমন সমাজবোধ থাকে তেমন সমাজের প্রতি তাঁর আনুগত্য থাকে। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে আত্মঅতিক্রমণ করে এবং সকলের সঙ্গে মিলিত হবার ঝোঁক মানুষের মনে তৈরী হয়। মানুষের এই প্রকৃতিগত ঝোঁকটাকে প্রকৃতিগত আত্মপ্রেরণা বলা যেতে পারে, এই আত্মপ্রেরণা থেকেই ঐক্যবোধ আসে। পরমমানবের সঙ্গে মিলনের চেতনাই হল পরম আধ্যাত্মিক সত্য। মানুষের ধর্ম হল সেই চেতনাকে কর্মের মাধ্যমে সার্থক করে তোলা। মানুষ সারাজীবন ধরে এই ধর্ম পালন করে থাকে।

বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেমন আমরা বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করি তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ পরমাত্মা অর্থাৎ বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করে। এইরকম চেষ্টার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে বিশ্বমানবের একটা একাত্মবোধ তৈরী হয়। এই একাত্মবোধই হল মানুষকে দেয় অমরতা, এই অমরতা ব্যক্তিসমূহের কাছে আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, "এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলছে, যেদিকে বিশ্বমানব।"[১] পূর্ণতার আদর্শ মানুষের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা জাগায়। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধি, বল ইত্যাদি থাকে সেগুলিকে মানুষ প্রকাশ করতে চায়। মানুষের মধ্যে যে পূর্ণ সত্তা থাকে সেটাকে বিকশিত করার জন্য মানুষ সদা আগ্রহী। এই পূর্ণতার আদর্শই মানুষকে সৃষ্টিকর্মে প্রেরণা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ সৃজনশীল প্রাণী। সৃজনশীলতায় মানুষের যথার্থ প্রকাশ ঘটে এবং এখানেই মানুষ অন্যান্য সকল প্রাণীর থেকে স্বতন্ত্র। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ স্বধর্মকে প্রকাশ করে। তিনি বলেছেন মানুষের মধ্যে ধর্মবোধ বর্তমান। ধর্মবোধ হল মহত্তর শক্তির নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন। এই মহত্তর শক্তির কাছে মানুষ নিজেকে তুচ্ছ মনে করে। এইজন্য মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় জেগে ওঠে। তিনটি বৃত্তির মাধ্যমে মানুষের মনে ধর্মবোধ গড়ে ওঠে। এই তিনটি বৃত্তি হল বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তি। অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়, "মানুষের ধর্ম হবে তাই যা মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকে বিকিশিত করতে সাহায্য করবে। ধর্মের প্রকৃত কাজ হবে তার তিনটি মূল বৃত্তির- বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির যুগপৎ সুসামঞ্জস্য পরিবর্ধন ঘটিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণ মানবরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।"[২] মানুষের গভীর ধীশক্তি বিশ্বের মহাশক্তির উপস্থিতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানুষ হল অনন্ত সম্ভাবনাময়। মানুষের সীমানা নির্দিষ্ট করা যায় না। মানুষ যেখানে মুক্ত সেখানেই সৃজনশীলতার ক্ষেত্র। মানুষের শক্তি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। কিন্তু জৈবিক ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি নিঃশেষিত হয় না এবং এর বাইরে যে শক্তি থাকে যেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাকে বলা হয় উদবৃত্ত। এই উদবৃত্ত শক্তির মাধ্যমে শিল্প, সাহিত্য সৃষ্টি হয়।

সৃষ্টিই হল রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের স্বভাবধর্ম, সবসময়ই মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছে। প্রয়োজনবদ্ধতা মানুষের স্বভাব নয়। মানুষ সৃষ্টি করে প্রতিনিয়তই যা প্রয়োজনকে ছাপিয়ে যায়। মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবল। এই ইচ্ছাটাই মানুষকে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। "সংসার মানুষের সত্য পরিচয়কে তুচ্ছতার আবরণ দিয়ে, অভ্যস্ততার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে। এই তুচ্ছতা তার ছদ্মবেশ। প্রতিদিনের সংসারে মানুষ তুচ্ছতার ভূমিকায় ছায়ার মতো অকিঞ্চিৎকর হয়ে থাকে। এ হল মানুষের তথ্যগত চেহারা। একে বলতে পারি মানুষের আত্মপ্রকাশের অবস্থা। তথ্যের সীমানার মধ্যে যতক্ষণ মানুষকে দেখি ততক্ষণ সে শীর্ণ, সীমিত, খণ্ডিত, মেঘাবৃত।"[৩] উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ এই তিনটি দিকের কথা বলা হয়েছে। একটি দিককে কেন্দ্র করে মানুষ বেঁচে থাকে। এই দিকটি হলো জৈবিক প্রয়োজনের দিক। দ্বিতীয় দিকে মানুষ জ্ঞানলাভ করে। এই দিকটি হলো মানুষের সাধনার এবং তৃতীয় দিকটিতে মানুষ শিল্প-সাহিত্য রচনা করে।

সৃষ্টিশীল মানুষই রবীন্দ্রনাথের কাছে আদর্শ মানুষ। মানুষ সবসময়ই স্বাধীন। শুধুমাত্র প্রয়োজনের জগতে মানুষ স্বাধীন নয়। সৃষ্টি ও স্রষ্টারূপেও মানুষ স্বাধীন। মুক্ত মানুষই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। মানুষ শিল্পিরূপেই যথার্থ মানুষ। জৈবিক প্রয়োজনে মানুষ কাজ করে, আর মানুষ সৃষ্টি করে আত্মার প্রেরণায় যদিও জ্ঞান, শক্তি, অনুভূতি মানুষের কাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে তথাপি মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ সম্পূর্ণ করতে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়। এই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে সকলের কল্যাণ সাধন করাই হল মানুষের সত্যিকারের কাজ।

রবীন্দ্রনাথের দর্শনে তিন ধরনের সত্তার কথা পাই, সেগুলি হল- প্রকৃতিসত্তা, মানবসত্তা ও পরমসত্তা। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিসত্তা, পরমসত্তা বলতে কি বুঝিয়েছেন সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এখন রবীন্দ্রনাথের মতে প্রকৃতিসত্তা, পরমসত্তা বিষয়ক আলোচনায় অগ্রসর হব।

প্রকৃতিসত্তা : ছেলে বেলা থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তিনি জীবন শুরু করেন প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের মাধ্যমে। 'জীবনস্মৃতিতে' পাই তিনি শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। তাঁর বাড়ীর চারপাশে ছিল সবুজের বিস্তার। গাছপালা, বাগানের ফুলের সৌন্দর্য শিশুকাল থেকেই কবির আকর্ষণের বস্তু ছিল। জলে হাঁসের সাঁতার দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। বাড়ীর সীমানায় সারিবদ্ধ নারকেল গাছগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি প্রতিদিন ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করে বাগানে যেতে ভুলতেন না। ভোরের আকাশের আনন্দ অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করতেন। একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর সেই ভাব ফুটে উঠেছে—

'আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী

তাই বাইরে ছুটেছি।'[৪]

প্রভাত সংগীত-এর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্রোতের প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। যাত্রাপথের প্রথম সঙ্গী প্রকৃতি। প্রকৃতির কত রঙ, কত রূপ, কত বৈচিত্রের বাহার। তিনি শুধু প্রকৃতির এই রূপ দেখেই মগ্ন হননি, তার পিছনে একটা প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—"সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-ইস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাকে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।"[৫]

প্রকৃতির নানা সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতো, তিনি শুধুমাত্র বাইরের রূপ দেখেই থেমে থাকেনি, প্রকৃতির মধ্যে তিনি এক প্রচ্ছন্ন সত্তাকে আবিষ্কার করেছিলেন। শরতের আকাশের মেঘমল্লারের সারি শুধু তাঁর নয়ন ভরিয়ে দেয়নি, তাঁকে ভাসিয়ে দিয়েছে, একথা ধ্বনিত হয় একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে—

"আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা"[৬]

বর্ষার আগমনে নীল আকাশে সাদা মেঘ সঞ্চার পরিবেশকে মধুর করে তোলে এবং রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে। এখানেও তার পিছনে তিনি এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতি অনুভব করেন। তিনি বলেছেন—

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরণের ভাব-উচ্ছাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ;
আকুল পরাণ আকাশের চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।"[৭]

তিনি নানা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একদিন প্রচ্ছন্ন সত্তা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের ন্যায় তিনিও উপলব্ধি করলেন প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সত্তার আভাস। অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায় "প্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুষ্পে যে প্রাণ-স্পন্দন আমাদের নয়নরঞ্জন করে, তারা সেই প্রচ্ছন্ন সত্তার আলোয় চরা ধেনু। আর গগনে যে অগণিত নক্ষত্ররাজি নিশার আকাশ উদ্ভাসিত করে তারা সব তাঁর আলোক ধেনু, তারা প্রকট, কিন্তু যিনি তাদের চরিয়ে বেড়ান, সেই রাখালটিকে দেখা যায় না, কেবল তাঁর বেণু শোনা যায়..."[৮]

পরমসত্তা : সকল মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে যা মানুষের মধ্যে অবস্থান করে মানুষকে অসীমের পথে চালিত করে। এই সত্তাকে তিনি পরমসত্তা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি এই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, তিনি পরমসত্তাকে পেতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তির প্রাচীর পেরিয়ে মানব জীবনের সেই পরম আনন্দময়, সত্তার কাছে যেতে হবে। তিনি মনে করেছিলেন মানুষের চিন্তাশক্তি মানুষের সম্মুখে যে সত্য তুলে ধরে তা হল কল্যাণকারী পরমসত্তা। জগতে সর্বত্র পরমসত্তার রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এই পরমসত্তাই পৃথিবীর পালন কর্তা, আর পরমসত্তাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনই হল মানুষের ধর্মবোধ। কেউ তাঁকে জ্ঞানশক্তির প্রয়োগ করে পেতে চেয়েছেন, কেউ তাঁকে কর্মের মাধ্যমে আবার কেউ তাঁকে ভক্তির মাধ্যমে পেতে চেয়েছেন।

মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরী করতে উৎসাহী এই পরমসত্তা ব্যক্তিরূপে প্রকাশমান, আর একে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্ব। তিনি অনেক জায়গায় পরমসত্তাকে 'জীবনদেবতা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।"[৯]

তিনি 'জীবনদেবতা'কে জীবনের কর্ণধার বলে মনে করতেন। এই জীবনদেবতা মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন। একই সাথে তিনি জীবনের অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী।

মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি হল পরিচালক ও অভিনেতার মতো। পরিচালক ও অভিনেতা দুজনেই ব্যক্তিরূপীসত্তা। দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। পরিচালক অভিনয় করেন না, অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করান। অভিনেতা ভাল অভিনয় করলে পরিচালক তৃপ্তি পান, আনন্দ পান আবার খারাপ অভিনয় করলে বেদনা পান। পরিচালক অভিনেতার ভিতর দিয়ে নিজের তৃপ্তি খোঁজেন। অনুরূপভাবে জীবন দেবতা জীবনের অভিনয়েও আছেন এবং বাইরেও আছেন। তিনি ব্যক্তি মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত নিকটে জেনেছিলুম, আপন সত্তার মধ্যে দুটি উপলব্ধির দিক আছে। এক, যাকে বলি, আমি; আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে যা-কিছু, যেমন আমার সংসার, আমার দেশ, আমার ধনজনমান, এই যা-কিছু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি ভাবনা-চিন্তা। কিন্তু, পরমপুরুষ আছেন সেই-সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে, নাটকের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা যেমন আছে নাটকের সমস্তটাকে নিয়ে এবং তাকে পেরিয়ে।"[১০]

এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বটি একদিনে গড়ে ওঠেনি, ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে একদিন হঠাৎ করে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটলো- এবিষয়ে তিনি হিবার্ট বক্তৃতামালায় এর উল্লেখ করেছেন।

এই 'জীবনদেবতা' রূপী পরমসত্তাটি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করছেন। ইনি জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেও ভক্তদের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। ভক্তের জীবন সার্থক হলেই তাঁর নিজের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভূবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনার এই হল সীমার মাঝে অসীমের লীলা। এখানে ঈশ্বর ও ভক্ত উভয়ে মিলে ভক্তের জীবনকে পরিস্ফুট করেছেন। ভক্তের জীবনের কর্মপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরেরই ইচ্ছা প্রকাশিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সঙ্গে বাউলদের সাধন তত্ত্বের ভীষণ রকম মিল দেখা যায়। বাউলরা পরমসত্তাকে ব্যক্তিতে ভূষিত করে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর পূজো করে। বাউলরা তাঁকে 'নরনারায়ণ' বলে সম্বোধন করেন। বাউলরা বিশ্বাস করত তিনি অরূপ আকারে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আছেন। বাউলারা একে 'মনের মানুষ' বলেও অভিহিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্য' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন বিশ্বদেবতা ও জীবনদেবতা একই সত্তা, কিন্তু তাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় পরমসত্তা দুটি স্তরে প্রকাশিত হয়। একটি বিশ্বের নিয়মক শক্তিরূপে, একে তিনি সত্যের প্রকাশ বলে স্বীকার করেছেন। এখানে তার কাজ নৈর্ব্যক্তিক সত্তার মতো। আর একটি প্রকাশ আনন্দরূপে। এখানে তিনি মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেছেন, বিশ্বজগতে নানা সৌন্দর্য স্থাপন করে ভক্তকে বলেছেন তোমার প্রেম আমায় দাও, আমার প্রেম তোমায় দিচ্ছি। এখানে তিনি ব্যক্তি মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "...বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্য্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয়, এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার; কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত, এটুকু না জানলে আমাদের কোন কাজের ক্ষতিই হয় না।"[১২]

রবীন্দ্রনাথের এই 'জীবনদেবতা' তত্ত্বের সঙ্গে উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের অনেক মিল পাওয়া যায়। এই তত্ত্বের দুটি রূপ আছে। একটি রূপ উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের মত একটি প্রচ্ছন্ন নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে স্বীকার করে, অন্য রূপটি বৈষ্ণবদের দ্বৈতবাদের মতো ভগবান ও ভক্তের ব্যক্তিরূপে দুটি আলাদা সত্তা স্বীকার করে। ভগবান একরূপে মানুষের প্রেমভিক্ষা করে এবং অন্যরূপে বেদান্তের সকল বস্তুর ধারক সত্তা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।"[১৩]

এ প্রসঙ্গে জীবনদেবতা তত্ত্বের সঙ্গে বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বের সাদৃশ্যের কথা বলা যেতে পারে। ভগবানের সঙ্গে চারটি রূপের কথা চৈতন্যচরিতামৃতে বলা আছে। এই চারটি রূপ হল দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং শৃঙ্গার। শৃঙ্গারকে মধুর রস বলা হয়ে থাকে। দাস্য ভগবানকে প্রভু হিসাবে, সখ্যে বন্ধু হিসাবে, বাৎসল্য পিতা, মাতা রূপে এবং শৃঙ্গারে ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রেম-প্রীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মধুর রসের সাধনা বলতে শ্রীরাধার সাধনার কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ের ভাষায়, "জীবনদেবতা-তত্ত্বের সঙ্গে মধুর রসের সাধনার মিলও আছে আবার অমিলও আছে। মিল এই জন্য যে উভয় ক্ষেত্রেই প্রীতি পরিপূর্ণতম রূপে প্রবাহিত হবার সুযোগ পায়। কিন্তু দুই তত্ত্বের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্যও আছে। রাধাভাবে সাধনায় ঠিক সাম্যের ভাব পাওয়া যায় না; তাঁর দয়িত যেন তাঁর থেকে বড়, এই ধরনের একটা চিন্তা বৈষ্ণব সাধনশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় স্বাতন্ত্র্য আছে। এখানে বলা হয়েছে রাজার রাজা হয়েও জীবনদেবতা ভক্তের প্রেমের ভিখারী। এই চিন্তায় সাম্যের বোধ অত্যন্ত প্রকট।"[১৪]

পরমসত্তার স্পর্শ পাওয়াই হল মানব জীবনের পূর্ণতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে- বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।... কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমায় মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে। বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে। এ কবি কথা নয়, এ বাক্যালংকার নয় - আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠেছে। বাতাসে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখঞ্জ তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্য আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়।... এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, নাক দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানা রকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।"[১৫]

এখানে তিনি যে মহাসংগীতের সুর শুনতে পাচ্ছেন আসলে সেটা পরমসত্তার ডাক। এখানে সব মিলেমিশে পরমসত্তায় পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছেন তুমি, আমি, কেউ নেই, আছে শুধু বীণা, এখানে তিনি বীণা বলতে পরমসত্তাকেই সূচীত করেছেন। তিনি একটি গানের মধ্যে দিয়ে বলেছেন—

"শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো...
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা- কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে—

ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।।"[১৬]

পরমসত্তাকে তিনি বন্ধু বলে আরাধনা করেছেন, বন্ধু ক্ষণিক স্পর্শ দিয়ে তার অনন্ত পথচলাকে সুন্দর করে তোলে। বন্ধুর নিবিড় আত্মীয়তা, সহচর্য তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে, তাই তিনি পরমসত্তাকে বন্ধুরূপে কল্পনা করেছেন। বন্ধুর সঙ্গে হাতে হাত রেখে পথ চলতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"বন্ধু রহো রহো সাথে

আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে।।
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে—
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে।।"[১৭]

তথ্যসূত্র

১। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৬২১।
২। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-২২।
৩। সাহিত্যচিন্তা, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পৃষ্ঠা-৭৬ থেকে উদ্বৃত।
৪। গীতিমাল্য, দুই সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-১০৫।
৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৪৯২।
৬। গীতাঞ্জলী, ৮ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-১৬।
৭। নববর্ষা, 'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-২৩১।
৮। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩০।
৯। আত্মপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-১৩৯।
১০। মানবসত্য, মানুষের ধর্ম, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৬৫৮।
১১। গীতাঞ্জলী, ১২১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৮১।
১২। সৌন্দর্য, শান্তিনিকেতন গ্রন্থ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৫৬৯।
১৩। গীতাঞ্জলী, ১২১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৮১।
১৪। উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৫০।
১৫। শোনা, শান্তিনিকেতন গ্রন্থ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তমখণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৫৪৫-৪৬।
১৬। গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা-৭৭।
১৭। ঐ, পৃষ্ঠা-৪০১।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, মানুষের ধর্ম ও রবীন্দ্রদর্শন, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১৩।
২। চৌধুরী, অমিতাভ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শনচিন্তা এবং সাহিত্য বিচার, এন এ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০১০।
৩। চক্রবর্তী, বসুধা, মানবতাবাদ, দীপায়ন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৯৭।
৪। নিয়গী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-১৪২০।
৫। পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ-১৯৯৯।
৬। ঘোষ, পীযুষকান্তি, মানবধর্ম, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১০ই জুন, ২০০২-০৩।
৭। রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও চতুর্দশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, পুনঃমুদ্রণ, পৌষ ১৪১৭।
৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৯৫।